উইক এন্ড এলেই নিদেনপক্ষে একটা পারিবারিক সমাবেশ প্রায় সবারই থাকে। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মিলাদ জাতীয় ব্যাপারতো লেগেই আছে। যখন সেসব কিছু থাকে না তখন কিছু বন্ধু পরিবার হয়তো মিলিত হয়ে একটা সন্ধ্যা হৈ-হট্টগোল করে কাটিয়ে দেয়। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি আমার পছন্দ। সপ্তাহের পাঁচদিন প্রানান্ত ঘানি টেনে অন্ততপক্ষে একটা দিন যদি পরনিন্দা, পরচর্চা করার সুযোগ না পাই, তাহলে আমার পুরো সাতদিনই বৃথা যায়। দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। জাকি একমাত্র সন্তান হওয়ায় গৃহে আমাকে এবং শিলিকেই তার জিকরে দোস্ত থেকে শুর" করে মুরব্বীর ভূমিকা পালন করতে হয়। এখানে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই বেশ দূরে বসবাস করেন। ফলে বেচারীর মামা-চাচা বলতে এই দেশে 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর' মতও কেউ নেই। 'মন্দের ভালো হোক' আর 'সমগ্রই মন্দ' হোক, এই দিশেহারা পিতৃব্যক্তিটিকেই 'একই অঙ্গে অনেক রূপ' ধারণ করে কখনো বাবা, কখনো মামা আবার কখনো কাকা-চাচার ভূমিকা পালন করতে হয়। সপ্তাহে যে ক'টা দিন স্কুল খোলা থাকে ছেলেমেয়েরা সাধারণত বেশ ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। বাবা-মায়েদের কাজ, ছেলেমেয়েদের স্কুল-তখন সামাজিকতা করবার অবসর থাকেই না বলা যায়। ছুটির দিন এলেই আমি গণজমায়েতের জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বহুরূপীর ভূমিকা থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। ক্ষুদে মানবেরা ক্ষুদে মানবদের সঙ্গ পায়, দগ্ধ মানবেরা দগ্ধদের।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় আমরা চলেছি জহীর ভাই ও সুফিয়া ভাবীর বাসায়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এই সমাবেশ 'এইতো এমনিই', কিন্তু গোপন সূত্রে শিলি

জেনেছে আজ তাদের পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। ফলে গিফ্‌ট কিনতে হয়েছে। পকেটে হাত গেলেই সর্বশরীরে ঝংকার ওঠে। অনেকে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে কিঞ্চিৎ অপমানজনক একটি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু প্রতিটি পয়সাও যখন অর্জিত হয় সততায় এবং শ্রমে, তখন মমতার বাহুল্য থাকা অবাঞ্ছিত নয়।

জহীর ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে দেখি এলাহি কান্ড। তাদের এটাচ্‌ড টাউন হাউস। পার্কিং স্পট অল্পই। বাসার সামনে রাস্তায় গাড়ীর সারি পড়ে গেছে। পার্কিং পাওয়া গেলো না। ডাবল পার্কিং করলাম। ভেতরে ঢুকে জহীর ভাইকে বলে রাখলেই হবে।

সদর দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখতেই সুফিয়া ভাবী হাসি মুখে স্বাগত জানালেন। লিভিংরমে ঢুকতেই শিশুদের দলটি ছুটে এলো। জনি, শাফিন, রাফিন, ইতি, বীথিসহ আরোও কয়েকটি অচেনা মুখ। জাকি তাদেরকে দেখেই আলোকিত হয়ে উঠলো। শিলি পুত্রকে ইদানিং সামাজিকভাবে উন্নত করে তুলবার চেষ্টা করছে। তার বহুবিধ অনুরোধেও পুত্রধরের সর্বদা খই ফোটা মুখেও সালাম জাতীয় কোন শব্দ এলো না। পিতা-মাতাদের ভিড় থেকে বেশ কয়েকটা কণ্ঠস্বরের করণ মিনতি ভেসে এলো

- "সালাম দাও আঙ্কেল-আন্টিকে, মানিক।"
- "কি হলো? কি শিখিয়েছি তোমাদেরকে?"
-"হাই (Hi) বলো।"

ইত্যাদি।

মুহূর্তের মধ্যে তাদের কলকাকলি থেমে গেলো। ক্ষনিক পূর্বের উজ্জ্বল মুখগুলিতে বেদনার বিরস ছাপ। দু'একটি কণ্ঠ বিড় বিড়িয়ে কিছু বললো, বোঝা গেলো না।

জনির মা সীমা খনা গলায় বললো, - "যা ভাগ সব বিচ্ছুর দল। একটা সালাম দিতে কইলে গলার মধ্যে বেজি ঢুকে। একডু গলাডা খুইলা সালাম দেওন যায় না? সালেমালেকুম! মনে হয় য্যান ঘুমাইয়া যাইতাছে।"

হাসির রোল ওঠে। বিচ্ছুর দল প্রথম সুযোগেই উধাও হয়। শিলি সীমার সাথে জোট পাকায়। ভাবীদের অনেকেই এসেছেন। আমি জনাবদের দলে ভিড়ে যাই। মাসুম ভাই, বিলাল ভাই, আলতাফ ভাই সহ আরোও অনেকেই এসেছেন। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে বেশ ভালো লাগলো। অনেকেই তাদের বয়েসী ছেলেমেয়েদেরকে সাথে নিয়ে এসেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হবার পর বাবা-মায়ের সাথে দাওয়াতে যাওয়াটা অসম্মানজনক মনে করতাম। এই তর"ণ-তর"ণীরা যে এই ধরণের সমাবেশে হাজির হয়েছে তা দেখে চিত্ত পুলকিত হওয়াটা স্বাভাবিক।

জহীর ভাইয়ের দুটি ছেলে। বড়টি অমল, ছোট অতল। দুজনই কমার্স থেকে অনার্স শেষ করে বাবার সাথে কোমর বেঁধে ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। ভদ্র, অমায়িক ছেলে দুটি। পরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা হাসি মুখে সামান্য একটি সম্বোধন করলেও জীবন ধন্য মনে হয়। তাদের সাথে রীতিমতো আলাপচারিতা চলে। শীঘ্রই উপস্থিত তর"ণ-তর"ণীদের সকলের সাথেই পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়। মঞ্জুর ভাই এবং আমিনা ভাবী দুজনই কৃষি-বিজ্ঞানে পেশাজীবী ছিলেন। কপালের লিখন, এ দেশে এসে বিল্ডিং ম্যানেজার হয়েছেন। কাজটি সম্মানজনক,তবে পেশাগত অভিজ্ঞতার অসামঞ্জস্য দুর্বল হৃদয়কে পীড়া দিতে পারে। তাদের মেয়ে ডেইজি স্থানীয় ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোতে জার্নালিজম পড়ছে। ছেলে রিয়াদ পড়ছে ইউনিভার্সিটি অব অটোয়াতে। চার ঘণ্টার দূরত্ব, হোস্টেলে থাকে। মাঝে মাঝে দয়া পরবশ হয়ে জনক জননীকে দর্শন দিয়ে যায়।

জায়েদ ভাই একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার। পূর্ব জীবনে খুব সম্ভবত পুলিশ অফিসার ছিলেন। তিনি পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। মা সততার স্কন্ধে আরোহন করে তার হৃদয় সরোবরে যে শান্ড়ি-সুখের হিলোল উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। নীনা ভাবী অবশ্য গৃহকর্মে সহযোগী অর্ধ ডজন কাজের লোকদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং আজ এতো বছর পরেও তিনি অভিযোগ করেন। তাদের দুটি ছেলে বশীর ও ইমন। বশীর ফিজিক্সের একটি এডভ্যান্স সাবজেক্টে পিএইচডি করছে। ইমন গ্রাজুয়েশন শেষ করে একটি সীমিত সময়ের চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলো। অল্প কিছুদিন হলো সে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে একাধিক স্থায়ী চাকরির অফার এসেছে। এই দেশের বিদ্যাপীঠে জ্ঞানার্জন করে কর্মহীন থাকার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। বিশেষত যাদের বিদ্যায় মনোযোগ আছে এবং ভবিষ্যতের সাফল্যে আগ্রহ আছে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে হয় না।

তবে সকলেই যে সমানভাবে সাফল্যে আগ্রহী হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কোন কোন তর"ণ মনে এমন প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় - সাফল্য কি? সাফল্যের মাপকাঠি কোনটি? বছরের পর বছর বিদ্যার্জনের এই প্রচেষ্টার অর্থ কি? শিহাব মামা ও বেলা মামীর বড় ছেলে আসিফ, কানে দুল ঝুলিয়ে আর চিবুকে চিকন কাট দাঁড়ি রেখে সে এমন একটি ভঙ্গি করছে যে তাকে কল্পনার কৃষ্ণ ডাকাতের মতো লাগছে; এই বুঝি রে-রে করতে করতে তেড়ে এসে টুটি চেপে ধরে। আজকাল চারদিকে গ্যাংএর বড় উপদ্রব শুর" হয়েছে। আসিফও সেই দলে নাম লিখিয়েছে কিনা কে জানে। বিদ্যার্জনে তার অনাগ্রহ সর্ববিদিত। সে একটি ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টে ক্যাশিয়ারের কাজ করে। এই মুখ দর্শনের পর ভোজনের তাগিদ বজায় থাকতে পারে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন দৃষ্টি হানলো।

খুব শীঘ্রই আমাদের পুরষ মহলে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে আলাপের ঝড় উঠে যায়। আমার জ্ঞান সীমিত, কিন্তু আলাপে অংশগ্রহণ করার তাগিদ অদম্য। স্বভাবজাত ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে, দু'একটি তথ্যের উপর ভরসা করে তর্কের তরী ভাসিয়ে দেই। নিকটেই সুপ্রশস্ড় ডাইনিং টেবিলের উপর সুফিয়া ভাবী সাজিয়ে রাখছেন নানান স্বাদের, নানান জাতের খাদ্য সম্ভার। জিহ্বার নীচে জলীয় উপস্থিতি বিপদজনকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থহীন তর্কে বিরতি দিতে হয়। অপেক্ষা করে থাকি কখন খাবারের আহ্বান আসবে। মৌ মৌ গন্ধে পেটে দামামা বাজছে।

আহ্বান এলো, তবে খাবারের নয়, 'হাইড এ্যান্ড সিক' (hide and seek) খেলার।

অতীতে, কোন এক কুক্ষণে এক দুর্বল মুহূর্তে আমাদের ক্ষুদে বাহিনীর সাথে লুকোচুরি খেলতে সম্মত হয়েছিলাম। এই মতিভ্রমের যথাযথ কারণ আজ মনে পড়ে না। কিন্তু পরিনতি যে সন্তোষজনক নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রতিটি পারিবারিক সমাবেশেই ক্ষুদেবাহিনী আমার সন্ধান করে। আমি তাদের বিশ্বস্ত 'সিকার' (seeker)। তারা হাইড করবেন আমি সিক করবো। সহজ হিসাব। কিন্তু ঘন ঘন দাওয়াতের কল্যাণে উদর এলাকার যে উত্থান শুরু হয়েছে তাকে সামাল দিয়ে এই চঞ্চলমনা ছেলে মেয়েগুলির পিছু ধাওয়া করে বেড়ানো কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক হয়ে উঠছে। তবুও তাদের অনুরোধ ফেলতে পারি না। এমন মায়াময় কচি মুখগুলোর মমতাভরা অনুরোধ কিভাবে ফেলি? জহীর ভাইদের বাসাটি তিনতলা টাউন হাউস। পাঁচমিনিটে চারবার চক্কর দেবার পর গলদঘর্ম হয়ে ইস্তফা দিলাম। অনেক অনুরোধ উপরোধেও টলানো গেলো না আমাকে। মার্ফা তিক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলো – "আংকেল বুড়া হয়ে গেছে। দেখছো না চুল পেকে যাচ্ছে।"

আঁতে লাগলো। দুদিকের জুলফিতে কয়েক ডজন আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাথাময় আরও কিছু, তাতে বার্ধক্যের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে।

বাচ্চারা বিদায় হতে আড়চোখে ডাইনিং টেবিলটা পরখ করি। খাদ্য সম্ভারে তার প্রান্তর পূর্ণ। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করে। খোলো খোলো দ্বার, রেখো না আর, দুয়ারে আমায় দাঁড়ায়ে। দুয়ারের পাটাতন যে আচমকা সটান বন্ধ হয়ে যাবে তা কে জানতো। হঠাৎ মেয়ে মহলে হৈ চৈ পড়ে গেলো। লজ্জার মাথা খেয়ে সেই ভিড়ে নাক গলাতে রহস্য উন্মোচিত হলো। সুফিয়া ভাবী মূর্ছা গেছেন। তার ডায়াবেটিস আছে। এতোগুলি অভ্যাগতদের জন্য আয়োজন করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে কৃপণতা করেছিলেন। ফলাফল সংজ্ঞাহীনতা। পানির ঝাপটাতেও যখন সংজ্ঞা ফিরলো না তখন ৯১১ এ কল করা হলো। প্রায় লহমার মধ্যে এম্বুলেন্স চলে এলো। এম্বুলেন্সের লাল নীল বাতির ঝলকে নাকি বাইরের ঠান্ডা বাতাসে বোঝা গেলো না, কিন্তু এম্বুলেন্সে তোলার আগেই সুফিয়া ভাবীর সংজ্ঞা ফিরলো। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সবাক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, - "কি হয়েছে? সবাই কি দেখো তোমরা?"

এম্বুলেন্স বিদায় হতেই তিনি আবার মূর্ছা গেলেন। এবারে পানির ঝাপটায় চোখ খুললেও বিছানা ছাড়বার শক্তি পেলেন না। এই হৈ হট্টগোলে খাদ্য সম্ভার শীতল বরফে পরিণত হলো। আমার মতো ক্ষুধার্ত নিশ্চয় আরোও অনেকেই ছিলেন, কিন্তু এই বিব্রতকর পরিবেশে খাদ্যের প্রসঙ্গ তুলতে আমারই যখন সংকোচ তখন তাদের দোষারোপ করবো কি? সুযোগ বুঝে সকলের চক্ষু বাঁচিয়ে দু'টি মুরগীর রোষ্ট হাতিয়ে নিলাম। পেছনের আঙ্গিনায় গিয়ে ঝটপট সাবাড় করতে হলো।

বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ড় খাওয়া হলো। সুফিয়া ভাবী টলমল পায়ে হাটতে হাটতে সবার কাছে এই বিঘ্নের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। জহীর

ভাই তার পেছনে স্বল্প দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলেছেন, আবার কখন কি হয়ে যায়।

প্রায় দেড়টার দিকে আসর ভাঙলো। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ বাচ্চাই দেড়টা পর্যন্ত চুটিয়ে খেলেছে। গাড়িতে উঠবার পরেই তারা আচমকা নিদ্রাপুরীতে পাড়ি দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

রাতের নীরবতা ভেদ করে আমরা বাসায় ফিরে যেতে থাকি ।